জোবায়দা উচ্চ বিদ্যালয়
আশেকপুর, টাঙ্গাইল।
বঙ্গবন্ধু কর্নার

মুজিব কর্ণার
জোবায়দা উচ্চ বিদ্যালয়, আশেকপুর, টাঙ্গাইল।

মুজিব কর্ণার
বিদ্যালয়, আশেকপুর, টাঙ্গাইল
আশেকপুর, টাঙ্গাইল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান

"বঙ্গবন্ধু" ও "মুজিবুর রহমান" কে এখানে পুনর্নির্দেশ করা হয়েছে। অন্য ব্যবহারের জন্য, বঙ্গবন্ধু (দ্ব্যর্থতা নিরসন) ও মুজিবুর রহমান (দ্ব্যর্থতা নিরসন) দেখুন।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সংগৃহীত স্থিরচিত্রে শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের ১ম রাষ্ট্রপতি

কাজের মেয়াদ
১১ এপ্রিল ১৯৭১ – ১২ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ
পূর্বসূরী	রাষ্ট্রপতির পদ স্থাপিত
উত্তরসূরী	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী)

বাংলাদেশের ২য় প্রধানমন্ত্রী

কাজের মেয়াদ
১২ জানুয়ারি ১৯৭২ – ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি	আবু সাঈদ চৌধুরী মোহাম্মদউল্লাহ
পূর্বসূরী	তাজউদ্দিন আহমেদ
উত্তরসূরী	মুহাম্মদ মনসুর আলী

বাংলাদেশের ৪র্থ রাষ্ট্রপতি

কাজের মেয়াদ
২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ – ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

প্রধানমন্ত্রী	মুহাম্মদ মনসুর আলী
পূর্বসূরী	মোহাম্মদউল্লাহ
উত্তরসূরী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ

সংসদ সদস্য
ঢাকা-১২

কাজের মেয়াদ
৭ মার্চ ১৯৭৩ – ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

পূর্বসূরী	সংসদীয় আসন প্রতিষ্ঠিত
উত্তরসূরী	জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল

সভাপতি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

কাজের মেয়াদ
১৯৬৬ – ১৯৭৪

পূর্বসূরী	আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ
উত্তরসূরী	আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান

ব্যক্তিগত বিবরণ

জন্ম	১৭ মার্চ ১৯২০ টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ মহকুমা, ফরিদপুর জেলা, বাংলা প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান টুঙ্গিপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ জেলা, বাংলাদেশ)

মৃত্যু	১৫ আগস্ট ১৯৭৫ (বয়স ৫৫)[১] নিজস্ব বাসভবন, ৩২ নং সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ
মৃত্যুর কারণ	গুপ্তহত্যা
নাগরিকত্ব	ব্রিটিশ ভারত (১৯২০–১৯৪৭) পাকিস্তান (১৯৪৭–১৯৭১) বাংলাদেশ (১৯৭১–১৯৭৫)
জাতীয়তা	বাংলাদেশী
রাজনৈতিক দল	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (১৯৭৫)
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	নিখিল ভারত মুসলিম লীগ (১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে) আওয়ামী লীগ (১৯৪৯–১৯৭৫)
দাম্পত্য সঙ্গী	বেগম ফজিলাতুন্নেসা
সন্তান	শেখ হাসিনা শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রেহানা শেখ রাসেল
মাতা	সায়েরা খাতুন
পিতা	শেখ লুৎফুর রহমান
আত্মীয়স্বজন	শেখ-ওয়াজেদ পরিবার
প্রাক্তন শিক্ষার্থী	ইসলামিয়া কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পুরস্কার	• জুলিও ক্যুরি শান্তি পুরস্কার (১৯৭৩) • স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০৩) • গান্ধী শান্তি পুরস্কার (২০২০)
স্বাক্ষর	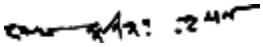

শেখ মুজিবুর
রহমানের
শব্দচিত্র

মেনু

0:00

জুলাই, ২০১৯
খ্রিষ্টাব্দ

এই নিবন্ধটি
শেখ মুজিবুর রহমান
সম্পর্কিত ধারাবাহিকের অংশ

বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

- প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা
- ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা
- পাকিস্তানে রাজনীতি
    - ছয় দফা আন্দোলন
    - স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ
    - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
    - ১৯৭০-এর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

- ৭ই মার্চের ভাষণ
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
- সরকার

প্রশাসন

- ১ম মন্ত্রীসভা
- ২য় মন্ত্রীসভা
- ৩য় মন্ত্রীসভা
- ৪র্থ মন্ত্রীসভা
    - বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ
    - দ্বিতীয় বিপ্লব
- জাতীয় রক্ষী বাহিনী
- ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ বাংলাদেশে অভ্যুত্থান
- শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড

পরিবার

- হত্যা ও পরবর্তী

- সামরিক অভ্যুত্থান
- ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে
- আগস্ট ১৯৭৫
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- কারাগারের রোজনামচা
- দ্য ব্ল্যাক কোট
- জোছনা ও জননীর গল্প
- দেয়াল
- হাসিনা: এ ডটার্স টেল
- বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ
- মুজিববাদ
- মুজিবনগর
- মুজিব কোট
- মুজিববর্ষ
- নামকরণের তালিকা

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর সম্মাননা জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান

গ্যালারি: চিত্র, শব্দ, ভিডিও

- দে
- স

শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ই মার্চ ১৯২০–১৫ই আগস্ট ১৯৭৫), সংক্ষিপ্তাকারে শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু, ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারত বিভাজন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শুরুতে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি, এরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রয়াস এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পেছনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে কৃতিত্ব স্বরূপ তাকে বাংলাদেশের "জাতির জনক" বা "জাতির পিতা" হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৯] এছাড়াও তাকে প্রাচীন বাঙালি সভ্যতার আধুনিক স্থপতি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিবেচনা করা

হয়।[৩] জনসাধারণের কাছে তিনি "শেখ মুজিব" বা "শেখ সাহেব" নামে এবং তার উপাধি "বঙ্গবন্ধু" হিসেবেই অধিক পরিচিত। তার কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন।[৪] সমাজতন্ত্রের পক্ষসমর্থনকারী একজন অধিবক্তা হিসেবে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন যাকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে ঘোষণা করেছিল।[৫] ছয় দফা দাবির মধ্যে প্রধান দাবি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, যার কারণে তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অন্যতম বিরোধী পক্ষে পরিণত হন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকারের সাথে যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে প্রধান আসামি করে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়; তবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।[৬] ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে; তা সত্ত্বেও তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়নি।

পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠন বিষয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা বিফলে যাওয়ার পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে গণহত্যা চালায়। ফলশ্রুতিতে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। একই রাতে তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।[৭] ব্রিগেডিয়ার রহিমুদ্দিন খানের সামরিক আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেও তা কার্যকর করা হয়নি।[৮][৯] নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে "বাংলাদেশ" নামক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তিনি সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১০] মতাদর্শগতভাবে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন; যা সম্মিলিতভাবে মুজিববাদ নামে পরিচিত। এগুলোর উপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা সত্ত্বেও তীব্র দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সর্বত্র অরাজকতাসহ ব্যাপক দুর্নীতি মোকাবেলায় তিনি কঠিন সময় অতিবাহিত করেন। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। এর সাত মাস পরে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত জনমত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন।[৩][১১][১২]

পরিচ্ছেদসমূহ

- ১প্রারম্ভিক জীবন
  - ১.১জন্ম
  - ১.২শিক্ষা
- ২ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা
  - ২.১পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তবঙ্গ ও দেশভাগ
- ৩পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংগ্রাম
  - ৩.১বাংলা ভাষা আন্দোলন
  - ৩.২আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা ও যুক্তফ্রন্ট সরকার
  - ৩.৩সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন
  - ৩.৪ছয় দফা আন্দোলন
  - ৩.৫আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
  - ৩.৬ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

    - ৩.৭৭০-এর সাধারণ নির্বাচন
    - ৩.৮৭ই মার্চের ভাষণ
    - ৩.৯ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক
- ৪কারাভোগ
- ৫বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা
    - ৫.১স্বাধীনতার ঘোষণা
    - ৫.২মুক্তিযুদ্ধ ও বন্দিজীবন
    - ৫.৩কারামুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
- ৬বাংলাদেশ শাসন
    - ৬.১সংবিধান প্রণয়ন
    - ৬.২নবরাষ্ট্র পুনর্গঠন
    - ৬.৩অর্থনৈতিক নীতি
    - ৬.৪পররাষ্ট্রনীতি
    - ৬.৫সামরিক বাহিনী গঠন
    - ৬.৬জাতীয় রক্ষীবাহিনী
    - ৬.৭রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- ৭হত্যাকাণ্ড
    - ৭.১প্রতিক্রিয়া ও বিচার
- ৮ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার
- ৯রচিত গ্রন্থাবলি
- ১০রাজনৈতিক মতাদর্শ
- ১১মূল্যায়ন
    - ১১.১উপাধি
    - ১১.২প্রাপ্তি ও পুরস্কার
    - ১১.৩সমালোচনা
- ১২জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে
    - ১২.১শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ
    - ১২.২মুজিব বর্ষ
- ১৩চিত্রশালা
- ১৪আরও দেখুন
- ১৫পাদটীকা
- ১৬তথ্যসূত্র
- ১৭গ্রন্থপঞ্জি
- ১৮বহিঃসংযোগ

প্রারম্ভিক জীবন

জন্ম

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের পৈতৃক ভিটা

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ (৩রা চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) রাত ৮টায়[১৩] তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদী তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] তিনি শেখ বংশের গোড়াপত্তনকারী শেখ বোরহানউদ্দিনের বংশধর। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার বা হিসাব সংরক্ষণকারী ছিলেন এবং তার মা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বড় বোনের নাম ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী এবং তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের।[১৫]

তার নানা শেখ আবদুল মজিদ তার নামকরণ করেন "শেখ মুজিবুর রহমান"। তার ছোটবেলার ডাকনাম ছিল "খোকা"।[১৬][১৭] ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের প্রতি সহমর্মী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলা থেকে ধান বিতরণ করতেন। সমিতি করে অন্যদের কাছ থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করে গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন।[১৬]

শিক্ষা

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ফুটবল খেলায় ট্রফি বিজেতা শেখ মুজিব

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাত বছর বয়সে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পিতার বদলিজনিত কারণে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদারীপুর ইসলামিয়া বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।[১৮] ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেরিবেরি নামক জটিল রোগে আক্রান্ত হন এবং তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তার চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ে ও অস্ত্রোপচার করাতে হয় এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করতে বেশ সময় লেগেছিল। এ কারণে তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুস্থ হবার পর গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বহু বছর জেল খাটা কাজী আবদুল হামিদ (হামিদ মাস্টার) নামীয় জনৈক ব্যক্তি তার গৃহশিক্ষক ছিলেন।[১৯] পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।[১৮]

১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।[২০] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি বেকার হোস্টেলের ২৪ নং কক্ষে থাকতেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সম্মানার্থে ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষকে একত্র করে "বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ" তৈরি করে।[২১] ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কক্ষটির সম্মুখে তার আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়।[২১] ভারত বিভাজনের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। তবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বহিষ্কার করে।[২২] পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।[১৪][২৩][২৪][২৫]

ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব (দণ্ডায়মান)

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকে। ঐ বছরই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ঐ সময় বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্কারের দাবি নিয়ে একটি দল তাদের কাছে যায়। দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব স্বয়ং।[১২] ব্যক্তিগত রেষারেষির জের ধরে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার করা হয়। ৭ দিন হাজতবাস করার পর তিনি ছাড়া পান। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি এবং মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।[১০] ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।[১৬] ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ প্রমুখ যোগদান করেন। শেখ মুজিব এই সম্মেলনের অন্যতম আয়োজক ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়নকালীন তিনি বাংলার অগ্রণী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। এম. ভাস্করণ তাকে "সোহরাওয়ার্দীর ছত্রতলে রাজনীতির উদীয়মান বরপুত্র" হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৭] একই বছর কলকাতায় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।[১৪] ঐ সময় থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১০] ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল

মুসলিম লীগে যোগ দেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল–পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।[২৮] ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন।[২৮]

পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তবঙ্গ ও দেশভাগ

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নেমে পড়ে। মুসলিম লীগের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব এ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।[২৯][৩০] "পাকিস্তান দাবির পক্ষে গণভোট" খ্যাত ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিব বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে লীগের ওয়ার্কার ইনচার্জের দায়িত্বে থেকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ কৃষক সমাজের কাছে গিয়ে তিনি পাকিস্তান দাবির ন্যায্যতার বিষয়ে প্রচার করে ভোট চান। এই নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে মুসলিম লীগ বিজয় লাভ করে। তবে একমাত্র বাংলায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।[৩০]

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সময় কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।[৩১][৩২] ঐ সময় সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃত্বের বাইরে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যে "যুক্তবঙ্গ আন্দোলন" সংগঠিত হয়, শেখ মুজিব তাতেও যুক্ত হন।[২৯] পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি নিশ্চিত হলে আসাম প্রদেশের বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব সিলেট গণভোটে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে কাজ

করেন। তিনি এসময় প্রায় ৫০০ কর্মী নিয়ে কলকাতা থেকে সিলেট গিয়েছিলেন। গণভোটে জয়লাভ সত্ত্বেও করিমগঞ্জ পাকিস্তান অংশে না থাকা এবং দেশভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভৌগোলিক অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে স্বীয় আত্মজীবনীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[টীকা ১][৩৩]

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংগ্রাম

আরও দেখুন: পূর্ব পাকিস্তান

ব্রিটিশ ভারত থেকে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক হবার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন।[২০] ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন,[৩৪] যার মাধ্যমে তিনি উক্ত অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।[৩৫]

বাংলা ভাষা আন্দোলন

আরও দেখুন: ভাষা আন্দোলন

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণকালে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। ঐ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

এছাড়াও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন।[৩৬] এতে পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। একই বছরের ২রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অংশগ্রহণে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যা থেকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৩৭][৩৮] ঐ পরিষদের আহ্বানে ১১ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্যান্য ছাত্র নেতাকে মুক্তি দেয়া হয়।[৩৯] তাদের মুক্তি উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় শোভাযাত্রা হয় যাতে শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। তবে পুলিশ এই শোভাযাত্রা অবরোধ করে রেখেছিল। ১৫ই মার্চ মুজিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়।[৩৮] পুলিশি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব অবিলম্বে ১৭ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন।[৪০] ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। একই সময়ে ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার[টীকা ২] বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সেই বছরেরই ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাকে আবার আটক করা হয়।[৪১]

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন যার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে বিজয় লাভ করেন।[৪২] শেখ মুজিব তার সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে পুনরায় আটক করা হয়। এ সময়েই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, মৃত্যু-পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তার হৃত ছাত্রত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেয়।[২৩][৪৩]

২৬শে জুন, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমনকে উপলক্ষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে এবারও শেখ মুজিবকে আটক করা হয় এবং দুই বছর জেলে আটক করে রাখা হয়।[৪৪] ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি মুজিবের জেলমুক্তির আদেশ পাঠ করার কথা থাকলেও খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরোক্ষভাবে পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সময়ে শেখ মুজিব জেলে অবস্থান করেই ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন স্থায়ী ছিল।[৩১][৪৫] ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।[১৪][৪৬][৪৭]

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক চীনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২রা অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানী পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান চীন সরকারের আমন্ত্রণে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এই সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে চীন সফর করেন।[৪৮][৪৯]

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা ও যুক্তফ্রন্ট সরকার

আরও দেখুন: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের আইনপরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান (মাঝে)

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৫০] তিনি ২৬শে জুন জেল থেকে ছাড়া পান। মুক্তি পাবার পরপরই চলমান খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে আটক করে রাখা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। একই বছরের অক্টোবর মাসে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে যুক্ত থেকে লিয়াকত আলি খানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় উভয়কেই আটক করা হয়।[৫১]

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে নবনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কাছ থেকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান[৫২]

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৫৩][৫৪] একই বছরের ১৪ই নভেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল।[৫৫] শেখ মুজিব গোপালগঞ্জে আসনে ১০,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন।[৫৬] সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান। ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকার গঠন করে এবং ১৫ই মে শেখ মুজিব উক্ত সরকারে যোগ দিয়ে কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।[৫৭] ২৯শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়। ৩১শে মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমান বন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন তিনি। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুন শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো গণপরিষদের সদস্য হন।[৫৮] ১৭ই জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৩শে জুন দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হলে আইনসভার সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন। ২৫শে আগস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন:[১৪]

(ইংরেজি)

«Sir (President of the Constituent Assembly), you will see that they want to place the word ‘East Pakistan’ instead of ‘East Bengal’. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word ‘Bengal’ has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about Autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.[৫৯]»

(বাংলা)

«স্যার (গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট), আপনি দেখবেন ওরা “পূর্ব বাংলা” নামের পরিবর্তে “পূর্ব পাকিস্তান” নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, পাকিস্তানের পরিবর্তে আপনাদের বাংলা (বঙ্গ) ব্যবহার করতে হবে। “বাংলা” শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য আছে। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবেন কিনা। এক ইউনিটের প্রশ্নটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটাই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নের সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো তারা যেন আমাদের জনগণের রেফারেন্ডাম অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন।[৫৯]»

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১–২৩শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে “মুসলিম” শব্দটি বাদ দেয়া হয় ও শেখ মুজিবকে পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৬০] ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ১৪ই জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রাখা হয় যা তিনিই সরকারের কাছে পেশ করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তার নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়।[৬১] ১৬ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব প্রাদেশিক সরকারে যোগ দিয়ে একসাথে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।[৬২] ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্মেলনে যোগদান করার জন্য নয়াদিল্লি যান। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সময় ব্যয় করার জন্যে তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৬৩][৬৪] ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি সরকারি সফরে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। এই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিক

জীবন-যাপনের সুবিধা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমাজতন্ত্রের প্রতি উজ্জীবিত করে তোলে। ১৯৫৭-৫৮ অর্থবছরের জন্য তিনি পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।[২০]

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। আইয়ুব খানের সমালোচনা করার জন্য ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তাকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও, তার উপর নজরদারি করা হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কার্যত গৃহবন্দি হিসেবে থাকেন।[৪৬] এ সময় আইয়ুব খান ৬ বছরের জন্য সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জেলে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বরে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৬৫] ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর জেল থেকে ছাড়া পান।[৬৫][৬৬][৬৭]

জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রনেতাকে নিয়ে গোপনে নিউক্লিয়াস ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা।[৬৬][৬৮] শেখ মুজিব ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন।[৬৭] ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি সামরিক সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান দলকে পুনরায় সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন।[২৮] ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়। ২রা জুন তারিখে চার বছরব্যাপী বহাল থাকা সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর ১৮ই জুন তাকে মুক্তি দেয়া হয়।[৪৪][৬৯] ২৫শে জুন তিনি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন। ৫ই জুন তিনি পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে যান এবং সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে প্রিয় শিষ্য শেখ মুজিব

পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে মিলে যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন ও একই বছরের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।[৯০] এরপর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের মহাসচিব[৯১] ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, রাজনীতির নামে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রেসি) প্রচলন এবং পাকিস্তানের কাঠামোতে এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব।[৯২] মৌলিক গণতন্ত্র অনুযায়ী সারা দেশ থেকে ৮০ হাজার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো ও তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা

করা হয়েছিল এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[৭২] ঐ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের ন্যায্য দাবী পূরণে সামরিক শাসকদের উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।[৭৩] অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করতে গিয়ে মুজিব আইয়ুববিরোধী সর্বদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন।[৭৪][৭৫] নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ভারতের দালাল অভিযুক্ত করে তাকে আটক করা হয়। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৭৬] অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

ছয় দফা আন্দোলন

মূল নিবন্ধ: ছয় দফা আন্দোলন

শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করছেন

জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (যেমন পাট) পূর্ব পাকিস্তান থেকে হবার পরও এতদাঞ্চলের জনগণের প্রতি সর্বস্তরে বৈষম্য করা হতো।[৭৭] এছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক হারে ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিকভিত্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এরফলে, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা বৈষম্য সম্পর্কে প্রশ্ন বাড়াতে শুরু করেন।[৭৮] বৈষম্য নিরসনে শেখ মুজিব ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন, যা ছয় দফা দাবি হিসেবে পরিচিত। বাঙালির বহু আকাঙ্ক্ষিত এই দাবি পরবর্তীকালে বাঙালির "প্রাণের দাবি" ও "বাঁচা মরার দাবি" হিসেবে পরিচিতি পায়।[৭৯][৮০] ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৪] এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা। ছয় দফার দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ–

1. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান।
2. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুইটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে–দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।
3. সমগ্র দেশের জন্যে দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন।
4. ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। তবে, প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে।
5. অঙ্গরাষ্ট্রগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।
6. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[৮১]

শেখ মুজিব এই দাবিকে "আমাদের বাঁচার দাবী" শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল–একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।[৮২] এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৫][৮২] এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

ছয় দফা দাবি পেশের পর তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সাথে নিয়ে লাহোর থেকে ফিরছেন শেখ মুজিব

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা মার্চে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচার কার্য পরিচালনা করেন ও প্রায় পুরো দেশই ভ্রমণ করে জনসমর্থন অর্জন করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দি হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাকে আটবার আটক করা হয়েছিল। ঐ বছরের মে মাসের ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়।[২৩] তার মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ এই ধর্মঘট চলাকালে গুলিবর্ষণ করে যার কারণে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আনুমানিক তিনজনের মৃত্যু হয়।[২৪]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

মূল নিবন্ধ: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে জেলে দুই বছর থাকার পর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন[টীকা ৩] বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত।[৬] ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।[টীকা ৪] তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" নামে অভিহিত করে। এই অভিযোগে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।[৮৫] মামলায় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ ও ১৩১ ধারা অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে।[৯৪] এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভক্তিকরণ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়।

১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসের এক বিশেষ ট্রাইবুনালে এ মামলার শুনানি শুরু হয়।[৬] বিচারকার্য চলাকালীন ২৬ জন কৌশলী ছিলেন। শেখ মুজিবের প্রধান কৌশলী ছিলেন আব্দুস সালাম খান। একটি অধিবেশনের জন্য ব্রিটেন থেকে আসেন আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস। তাকে সাহায্য করেন তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও মওদুদ আহমেদ। মামলাটিতে মোট ১০০টি অনুচ্ছেদ ছিল। ১১ জন রাজসাক্ষী ও ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়। মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের, এম আর খান ও মুকসুদুল হাকিম।[৬] এর অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মামলাটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের জনসাধারণ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

মূল নিবন্ধ: ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে, তন্মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮৬][৮৭] উক্ত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আন্দোলনটি এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীকালে এই গণআন্দোলনই "ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" নামে পরিচিতি পায়। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের ঘটনার পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। একই সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐ বছরেরই ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার অংশগ্রহণে আয়োজিত এই সম্মেলনে তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করেন।[৮৮][৮৯][৯০] স্বীয় বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তার ছয় দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবিগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু, তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন তিনি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলাদেশ" নামে নামকরণের ঘোষণা দেন।[টীকা ৫][৩১] মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারাদেশে ব্যাপক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্মকর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অনেক বুদ্ধিজীবীদের মতে, যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদানে সাহায্য করে।[৯১] তবে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

মূল নিবন্ধ: পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭০

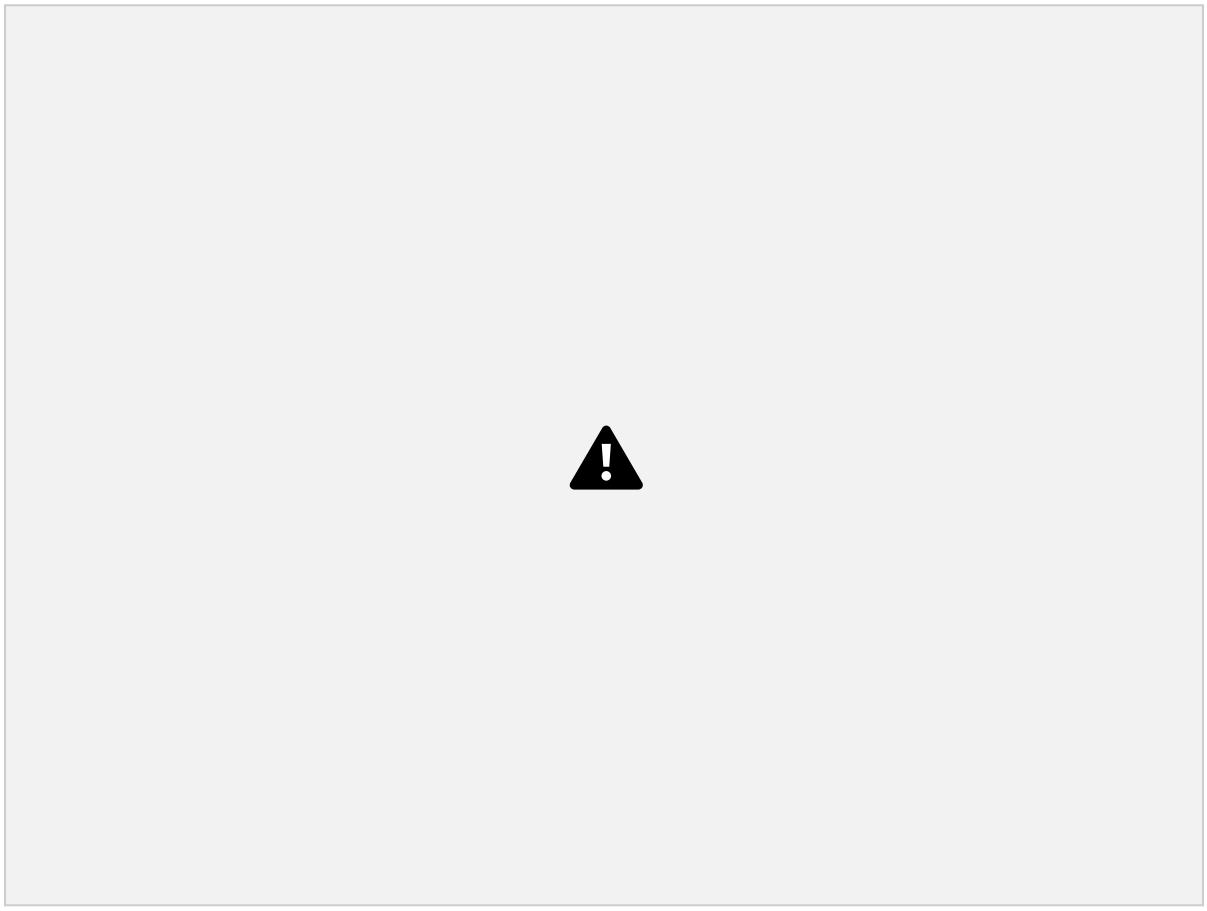

৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণায় শেখ মুজিব

গণঅভ্যুত্থানের বিরূপ প্রভাবে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।[৯২] ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন।[৯৩] তিনি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ভোলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে।[৯৪] এতে জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের দুর্বল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে 'স্থানীয় নেতাদের ব্যর্থতা' হিসেবে উল্লেখ করে।[৯৫] এসময় শেখ মুজিব বাস্তুহারাদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে থাকেন। ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নির্বাচনের সময়সূচি পিছিয়ে দেয়া হয়।[৯৪][৯৬] পরে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর (জাতীয়) ও ১৭ই ডিসেম্বর (প্রাদেশিক) "এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৯৭] ঐ সময় জাতীয় পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৬৯ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৪৪ জন প্রতিনিধি থাকতেন।[৯৮][৯৯] ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ায় জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ।[১০০] ১৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।[১৪][২২][৯৭][১০১]

নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণের সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো অধিবেশন বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি ঐ সরকারকে মেনে নেবেন না।[১০২][১০৩] অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো শেখ মুজিবের আসন্ন প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের প্রবল বিরোধিতা করে। এসময় শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেননি, যদিও কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করতে থাকে।[১০৪] জুলফিকার আলি ভুট্টো গৃহযুদ্ধের ভয়ে শেখ মুজিব ও তার ঘনিষ্ঠজনদেরকে নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য একটি গোপন বার্তা পাঠান।[১০৫][১০৬] পাকিস্তান পিপলস পার্টির মুবাশির হাসান শেখ মুজিবকে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে প্ররোচনা দেন; যেখানে শেখ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টো থাকবেন রাষ্ট্রপতি।[১০৭] সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের অগোচরে সম্পূর্ণ গোপনে এই আলোচনা সভাটি পরিচালিত হয়। একইসময়ে, ভুট্টো আসন্ন সরকার গঠনকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।[১০৮]

৭ই মার্চের ভাষণ

মূল নিবন্ধ: সাতই মার্চের ভাষণ

সাতই মার্চের ভাষণ দিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সামরিক শাসকগোষ্ঠী দলটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল

ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন।[১০৯] কিন্তু তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ১লা মার্চ উক্ত অধিবেশনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন।[১১০][১১১][১১২] এরফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝতে পারে যে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না।[৭১] এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে সকল প্রকার দোষ তার উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালান। এ ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুলসংখ্যক লোক একত্রিত হয়। সাধারণ জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা দেন–

> "... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"[১১৩]

এর কয়েক ঘন্টা পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার গণমাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[১১৪] সেনাবাহিনীর চাপ থাকা সত্ত্বেও ইএমআই মেশিন ও টেলিভিশন ক্যামেরায় ভাষণের অডিও এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করে রাখা হয়।[১১৪][১১৫] ৮ই মার্চ জনতার চাপে ও পাকিস্তান রেডিও'র কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে পাকিস্তান সরকার বেতারে এই ভাষণ পুনঃপ্রচারের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।[১১৫]

ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক

আরও দেখুন: অপারেশন সার্চলাইট

১০ই মার্চ নির্বাচিত ১২ জন সংসদীয় শীর্ষস্থানীয় নেতাকে ইয়াহিয়া খান বৈঠকের আমন্ত্রণ জানালে শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৫ই মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট ৩৫টি নির্দেশনা জারি করেন।[টীকা ৬][১১৬] ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন।[১১৭] কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। সেনাবাহিনীর জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ঢাকায় প্রেরণের পাশাপাশি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হতে থাকে।[১১৮] ১৯শে মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে মার্চ আলোচনায় যোগ দিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১২ জন উপদেষ্টাকে সফরসঙ্গী করে ঢাকা আসেন। ২২শে মার্চ ভুট্টো-মুজিবের ৭০ মিনিটের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১১৯] অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও ভুট্টো-মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সফল হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ২৫শে মার্চ ভুট্টো-ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত অপারেশন সার্চলাইট প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করেন। উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার শেখ মুজিবকে বিষয়টি জানান। ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঐদিনই রাত ১টা ১০ মিনিটে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।[১১৯][১২০]

কারাভোগ

শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাভোগ করেছেন।[৪৪] তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাত দিন কারাভোগ করেন। বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন তিনি কারাভোগ করেন পাকিস্তান সরকারের আমলে। শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের প্রায় ১৩ বছর কারাগারে ছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে সহপাঠী বন্ধু আবদুল মালেককে মারপিট করা হলে শেখ মুজিবুর রহমান সেই বাড়িতে গিয়ে ধাওয়া করেন। সেখানে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলে হিন্দু মহাসভার

নেতাদের কৃত মামলায় শেখ মুজিবকে প্রথমবারের মতো আটক করা হয়।[১২১] সাত দিন জেলে থাকার পর মীমাংসার মাধ্যমে মামলা তুলে নেওয়া হলে শেখ মুজিব মুক্তি পান।[১২২] এছাড়া ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলা শাখার সহসভাপতি থাকা অবস্থায় বক্তব্য প্রদান এবং গোলযোগের সময় সভাস্থলে অবস্থান করায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দুইবার সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়।[১২৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিব ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিন কারাগারে ছিলেন। একই বছর ১১ই সেপ্টেম্বর আটক হয়ে মুক্তি পান ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি। এ দফায় তিনি ১৩২ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল আবারও তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় ও ৮০ দিন কারাভোগ করে ২৮শে জুন মুক্তি পান। ওই দফায় তিনি ২৭ দিন কারাভোগ করেন। একই বছরের ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩ দিন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি টানা ৭৮৭ দিন কারাগারে ছিলেন।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও শেখ মুজিবকে ২০৬ দিন কারাভোগ করতে হয়। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির পর ১১ই অক্টোবর শেখ মুজিব আবার গ্রেফতার হন। এ সময়ে টানা ১ হাজার ১৫৩ দিন তাকে কারাগারে কাটাতে হয়। এরপর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি আবারও গ্রেফতার হয়ে মুক্তি পান ওই বছরের ১৮ই জুন। এ দফায় তিনি কারাভোগ করেন ১৫৮ দিন। এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ৬৬৫ দিন কারাগারে ছিলেন। ছয় দফা প্রস্তাব দেয়ার পর তিনি যেখানে সমাবেশ করতে গেছেন, সেখানেই গ্রেফতার হয়েছেন। ওই সময়ে তিনি ৩২টি জনসভা করে বিভিন্ন মেয়াদে ৯০ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে আবারও গ্রেফতার হয়ে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পান। এ সময় তিনি ১ হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এ দফায় তিনি কারাগারে ছিলেন ২৮৮ দিন।[৪৪][১২২]

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

আরও দেখুন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার ও ১৯৭১ বাংলাদেশে গণহত্যা

স্বাধীনতার ঘোষণা

মূল নিবন্ধ: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

গ্রেফতারের পর করাচি বিমানবন্দরে দুইজন পুলিশ কর্মকর্তার সামনে উপবিষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭১

ইয়াহিয়া খান ২৭ মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে এক ঘোষণায় সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।[১২৩] পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[টীকা ৭][৩১][১২৪] ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ:

> “এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। জয় বাংলা।”[১২৫][১২৬]

এর কিছুক্ষণ পর তিনি বাংলায় একটি ঘোষণা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন–

> “সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রু বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক লোকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।”[১২৫][১২৭]

টেক্সাসে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, "বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এটিই প্রমাণিত হয় যে, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল তার বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেওয়ার অনেক পূর্বে।"[১২৮]

স্বাধীনতা ঘোষণার পরই রাত ১টা ৩০ মিনিটের সময় শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর একটি দল তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ও সামরিক জিপে তুলে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।[১২৯][১৩০] ঐ রাতে তাকে আটক রাখা হয় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে। পরদিন তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিমানে করে করাচিতে প্রেরণ করা হয়। করাচি বিমানবন্দরে পেছনে দাঁড়ানো দুই পুলিশ কর্মকর্তার সামনের আসনে বসা অবস্থায় শেখ মুজিবের ছবি পরদিন প্রায় সব দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এর আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে শেখ মুজিবকে ক্ষমতালোলুপ দেশপ্রেমবর্জিত লোক আখ্যা দিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতির ওপর আঘাত হানা এবং ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগ তোলেন ও বলেন যে এই অপরাধের শাস্তি তাকে (শেখ মুজিবকে) পেতেই হবে।[১২৯]

মুক্তিযুদ্ধ ও বন্দিজীবন

লাহোর থেকে ৮০ মাইল দূরে পাকিস্তানের উষ্ণতম শহর লায়ালপুরের (বর্তমান ফয়সালাবাদ) কারাগারে শেখ মুজিবকে কড়া নিরাপত্তায় আটকে রাখা হয়। তাকে নিঃসঙ্গ সেলে (সলিটারি কনফাইন্টমেন্ট) রাখা হয়েছিল।[১২৯] এদিকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমানে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর) প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ হন প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত করে। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত।[১৩১][১৩২]

১৯শে জুলাই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সামরিক আদালতে মুজিবের আসন্ন বিচারের বার্তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান এই আদালতের নেতৃত্ব দেন। তবে মামলার প্রকৃত কার্যপ্রণালী ও রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। লায়ালপুর কারাগারেই সামরিক আদালত গঠন করা হয়। তাই মামলাটি "লায়ালপুর ট্রায়াল" হিসেবে অভিহিত।[১৪] এই মামলার শুরুতে সরকারের দিক থেকে প্রবীণ সিন্ধি আইনজীবী এ. কে. ব্রোহিকে অভিযুক্তের পক্ষে মামলা পরিচালনায় নিয়োগ দেয়া হয়। আদালতের কার্যক্রমের শুরুতে ১২ দফা অভিযোগনামা পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগের মধ্যে ছিল–রাষ্ট্রদ্রোহ, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। ছয়টি অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আদালতে ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চ প্রদত্ত ভাষণের টেপ রেকর্ডিং বাজিয়ে শোনানো হয়। সেই বক্তব্য শোনার পর শেখ মুজিব আদালতের কোনো কার্যক্রমে অংশ নেওয়া এবং তার পক্ষে কৌঁসুলি নিয়োগে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এই বিচারকে প্রহসন আখ্যা দেন। গোটা বিচারকালে তিনি কার্যত আদালতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন। আদালত কক্ষে যা কিছু ঘটেছে, তা তিনি নিস্পৃহতা দিয়ে বরণ করেছিলেন। বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন তো দূরের কথা, কোনো কার্যক্রমেই অংশ নেননি তিনি।[১২৯]

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি সামরিক বিমানঘাঁটি আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। পরদিন, ৪ঠা ডিসেম্বর সামরিক আদালত বিচারের রায় ঘোষণা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শেষে তাকে নেওয়া হয় মিয়ানওয়ালি শহরের আরেকটি কারাগারে। সেখানে দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ব্যবস্থা চলতে থাকে। বলা হয়ে থাকে, যে কারাগার কক্ষে তিনি অবস্থান করেছিলেন, তার পাশে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[১২৯] আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তার সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।[১৩৩]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন।[১৩৪]

কারামুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করার ফলশ্রুতিতে ২০শে ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাচ্যুত হলে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন।[১৩৫] ক্ষমতা হস্তান্তরকালেও ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অনুরোধ করেন।[টীকা ৮] কিন্তু ভুট্টো নিজের স্বার্থ, বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের পরিণতি ও আন্তর্জাতিক চাপের কথা চিন্তা করে শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করতে চাননি।[১৩৫][১৩৬] শেখ মুজিবের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়ে ফেলতে চান এবং মিঁয়াওয়ালী কারাগারের প্রধান হাবিব আলীকে সেরূপ আদেশ দিয়ে জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। ২২শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানকে মিঁয়াওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং একটি অজ্ঞাত স্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এরপর ২৬শে ডিসেম্বর সিহালার পুলিশ রেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো ঐদিন সেখানে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন।[১৩৫][১৩৬] ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২৯ অথবা ৩০ ডিসেম্বর)[১৩৭]

পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সাথে এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আবার ভুট্টোর সাথে মুজিবের বৈঠক হয়। ভুট্টো তাকে পশ্চিম পাকিস্তান ও নবগঠিত বাংলাদেশের সাথে ন্যূনতম কোন "লুস কানেকশন" রাখার অর্থাৎ শিথিল কনফেডারেশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় এসে জনগণের মতামত না জেনে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন।[১৩৫][১৩৬]

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি ভুট্টো শেখ মুজিবের পাকিস্তান ত্যাগের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। সেদিন রাত ২টায় অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারির প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান ও ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি ছাড়ে। ভুট্টো নিজে বিমানবন্দরে এসে শেখ মুজিবকে বিদায় জানান।[১৩৭] লন্ডনে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ও "ভারতের জনগণ আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু" বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১৩৮] তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এসে তিনি সেদিন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।[১৩৮]

বাংলাদেশ শাসন

মূল নিবন্ধ: স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ পুনর্গঠন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান আইনসভার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠন করেন। ১২ই জানুয়ারি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেন।[২০]

সংবিধান প্রণয়ন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান তার অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে শেখ মুজিব স্বাক্ষর করেন। ১৫ই ডিসেম্বর শেখ মুজিব সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের ঘোষণা দেন। ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, 'শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারার চারটি বৈশিষ্ট্য হলো বাঙালি জাতিসত্তা, সমাজতন্ত্র, জনসম্প্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতা। সংবিধানের চারটি মূলনীতি–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে চারটি বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই চারটি মূলনীতিকে একসাথে মুজিববাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।'[১৩৯][১৪০]

৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১৪১][১৪২] ঐ নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শেখ মুজিব ঢাকা-১২ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন।[১৪৩]

নবরাষ্ট্র পুনর্গঠন

আরও দেখুন: দ্বিতীয় বিপ্লব (বাংলাদেশ)

জনগণের সাথে এক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিচালিত নয় মাসব্যাপী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।[টীকা ৯][১৪৪][১৪৫] শেখ মুজিব এই ধ্বংসযজ্ঞকে "মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ" হিসেবে উল্লেখ করে ৩০ লাখ মানুষ নিহত ও ২ লাখ নারীর ধর্ষিত হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।[১৪৫] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনের জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হাতে নেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা এবং ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলাপূর্বক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালান।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনরায় চালু করেন।[১৪৬] ইসলামি গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন।[১৪৭] তার শাসনে অসন্তুষ্ট ডানপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর সমর্থন পেতে তিনি সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায়

তিনি “মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তাকারী দালালেরা” তাদের ভুল বুঝতে পেরে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং দালাল অধ্যাদেশে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন।[১৪৭] তবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘর পোড়ানো ও বিস্ফোরক ব্যবহারে ক্ষতিসাধনের জন্য দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি।[১৪৮][১৪৯] অত্যন্ত অল্প সময়ে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ ছিল শেখ মুজিব সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি এবং নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। গ্রাম বাংলার ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য তিনি “খাই-খালাসী আইন” পাশ করেন। গ্রাম বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শিল্প-কৃষি উৎপাদনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকারগুলোতে গণতন্ত্রায়নের সূচনা করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভায় প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রশাসনে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ১৩ মাসে ১০ কোটি টাকা তাকাবি ঋণ[টীকা ১০] বন্টন, ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন, ১০ লাখ বসতবাড়ি নির্মাণ, চীনের কয়েক দফা ভেটো সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, ৩০ কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাবর্তন শুরুসহ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে শেখ মুজিব বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেন।[১২] মুজিব শতাধিক পরিত্যক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং ভূমি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে ভূমি পুনর্বন্টনের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১৫০] মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরফলে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান হতে শুরু করে এবং সমূহ দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।[১৫১] এছাড়াও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান। শেখ মুজিবের নির্দেশে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জুন সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে পূর্বের ১৯টি বৃহত্তর জেলার স্থলে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৬ই জুলাই শেখ মুজিব ৬১ জেলার প্রতিটির জন্য একজন করে গভর্নর নিয়োগ দেন।[১৫২]

অর্থনৈতিক নীতি

নব নির্বাচিত মুজিব সরকার গুরুতর কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তন্মধ্যে ছিল–১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি। এছাড়া ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এবং যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও চরমভাবে ভেঙে পড়েছিল।[১৫৩] অর্থনৈতিকভাবে, মুজিব একটি বিস্তৃত পরিসরের জাতীয়করণ কার্যক্রম হাতে নেন। বছর শেষ হতে না হতেই, হাজার হাজার বাঙালি পাকিস্তান থেকে চলে আসে ও হাজার হাজার অবাঙালি পাকিস্তানে অভিবাসিত হয়। তাসত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ শরণার্থী শিবিরগুলোতে রয়ে যায়। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করার জন্য বৃহৎ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়।[১৫১] ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (১৯৭৩–১৯৭৮) কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে প্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়।[১৫৪] তারপরও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চালের দাম আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাবার ফলে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, যা ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। উক্ত দুর্ভিক্ষের সময় রংপুর জেলায় খাদ্যাভাব ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের অব্যবস্থাপনাকে সেসময় এর জন্যে দোষারোপ করা হয়।[১৫৫] মুজিবের শাসনামলে দেশবাসী শিল্পের অবনতি, বাংলাদেশি শিল্পের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ এবং জাল টাকা কেলেঙ্কারি প্রত্যক্ষ করে।[১৫৬]

পররাষ্ট্রনীতি

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে সাক্ষাৎকালে শেখ মুজিবুর রহমান

চার বছরের কম সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে যে সাফল্য এনেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের স্বীকৃতিও আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। "কারো সাথে বৈরিতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব" ছিল মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি।[১৫৭] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ ১১৩টি[টীকা ১১] দেশের স্বীকৃতি লাভ করে।[২০] শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ গ্রহণ করে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়নকল্পের জন্য সহযোগিতা চান।[৩১]

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৩৮] মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন।[১৫৮] মুজিবের জীবদ্দশায় দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতাপূর্ণ সমঝোতা ছিল।[১৪০] শেখ মুজিবের অনুরোধক্রমে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় বাহিনীকে নিজ দেশে ফেরৎ নিয়ে যান।[৩১] ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। দেশটির শীর্ষ চার নেতা পোদগর্নি,

কোসিগিন, ব্রেজনেভ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো তাকে অভ্যর্থনার জন্য ক্রেমলিনে সমবেত হন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জাপান সফর করেন। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো শেখ মুজিবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।[১৫৯]

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে যোগ দেন।[১৬০] উক্ত সম্মেলনে মুজিবের চরমতম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী ভুট্টো তার সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন[১৬১] যা পাকিস্তানের সাথে কিছুমাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে।[১৪৭] তিনি একই বছরের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সেখানে জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ৫০টি সমস্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।[১৬২]

সামরিক বাহিনী গঠন

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কুচকাওয়াজে শেখ মুজিব

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। নবগঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য বিস্তৃত প্রকল্প গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করেন। যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে পদাতিক বাহিনীর জন্য ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারি অস্ত্র আনা হয়। ভারতের অনুদানে ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তৎকালে উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক আকাশযান মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন

বিমান সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে মিসর থেকে সাজোঁয়া গাড়ি বা ট্যাংক আনা সম্ভব হয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান লাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে সে উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব সামরিক কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করে এবং সিগন্যাল শাখাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলে। শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী আরও ত্রিশ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। প্রত্যাবর্তনকারী বাঙালি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০। এই সকল কর্মকর্তা ও জওয়ানদের নিয়ে অর্ধ লক্ষের অধিক সদস্যের দেশের প্রথম সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। সামরিক সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য শেখ মুজিবের নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীঘিনালা, রুমা, আলীকদমের ন্যায় ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ছাউনি গড়ে তোলা হয়।[১৭]

জাতীয় রক্ষীবাহিনী

মূল নিবন্ধ: জাতীয় রক্ষীবাহিনী

শেখ মুজিবের ক্ষমতালাভের পরপরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র বিভাগ গণবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত বামপন্থী বিদ্রোহীরা মার্ক্সবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।[১৬৩][১৬৪] গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৪শে জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করেন। এরপর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়।[১৬৫][১৬৬] রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর এক-ষষ্ঠাংশ।[১৭] শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই ঐ বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। এর কারণ রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড,[১৬৭][১৬৮] গুম, গোলাগুলি,[১৬৯] এবং ধর্ষণের[১৬৮] সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তাদের যথেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতার আইনগত কোন ব্যবস্থা ছিল না। অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রতি অত্যাচার, লুটপাট এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ন্যায় জলপাই রঙের পোশাক এবং বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণে ভারতের সহায়তা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

গণঅসন্তোষ সত্ত্বেও মুজিব সরকার ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর "জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৭৩" জারি করে রক্ষীবাহিনীর সকল কার্যকলাপ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেন।[১৭০] এতে জনগণের মধ্যে মুজিব সরকারের প্রতি সুপ্ত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সেইসাথে রক্ষীবাহিনীর বিভিন্ন অনাচারের কারণে জনগণের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।[১৭১] রক্ষীবাহিনীকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর অভিযোগে সেনাবাহিনীর একাংশের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।[১৭২]

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

আরও দেখুন: বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

স্বাধীনতার পর অচিরেই মুজিবের সরকারকে ক্রমশ বাড়তে থাকা অসন্তোষ সামাল দিতে হয়। তার রাষ্ট্রীয়করণ ও শ্রমভিত্তিক সমাজতন্ত্রের নীতি প্রশিক্ষিত জনবল, অদক্ষতা, মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি আর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৫০] মুজিব অতিমাত্রায় জাতীয় নীতিতে মনোনিবেশ করায় স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ করায় গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে কোন নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়নি।[১৭৩] আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে কমিউনিস্ট এবং ইসলামপন্থীরা অন্তর্ভুক্ত

ছিল। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করায় ইসলামপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।[১৭৪] এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ দেয়ার জন্য মুজিবের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়।[১৪০]

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে দেয় এবং অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষিকে ধ্বংস করে ফেলে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, দ্রব্যমূল্যের অসামঞ্জস্যতা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে মুজিবকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।[১৫০] রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংঘাতের মাত্রা বাড়তে থাকায় মুজিবও তার ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুজিব জরুরি অবস্থা জারি করেন।[১৭৫] এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি শেখ মুজিব নতুন যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, একে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যা দেন।[টীকা ১২][১৭৬]

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল–সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি।[১৭৬] ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ সরকারে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। পরিবর্তিত সংবিধানের আওতায় ৬ই জুন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল, সরকারি-বেসরকারি এবং অন্যান্য সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। এ সময় শেখ মুজিব নিজেকে আমৃত্যু রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন।[টীকা ১৩][১৭৬] বাকশাল প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের বিবেচিত করে এককভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে থাকে। বাকশাল বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারপন্থী চারটি সংবাদপত্র বাদে সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়।[১৭৪] শেখ মুজিব জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় বাকশাল-বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করেন এবং সারাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন।[১৭৭] অনেকের মতে, তার এই নীতির ফলে অস্থিতিশীল অবস্থা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দুর্নীতি, কালোবাজারী ও অবৈধ মজুদদারি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। তবে রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও মুজিব নীরব ভূমিকা পালন করেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারীরা মুজিবের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন[১৭৮] এবং তার কর্মকাণ্ডকে গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিরোধী বলে গণ্য করেন।[১৪০] মুজিব ও বাকশাল বিরোধীরা গণঅসন্তোষ এবং সরকারের ব্যর্থতার কারণে মুজিব-সরকারের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ওঠে।[১৭৪]

হত্যাকাণ্ড

মূল নিবন্ধ: শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড

শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট প্রত্যূষে একদল সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির ধানমন্ডিস্থ বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে।[টীকা ১৪][১৪][১৪০] শেখ মুজিবের পরিবারের সদস্য–বেগম ফজিলাতুন্নেসা, শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকী, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী, শেখ রাসেল, শেখ মুজিবের ভাই শেখ আবু নাসের হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এই দিন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এবং তার স্ত্রী বেগম আরজু মনি, শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতনি সুকান্ত বাবু, বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত ও এক আত্মীয় বেন্টু খানকে হত্যা করা হয়।[১৭৯][১৮০] এছাড়া শেখ মুজিবের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা জামিল উদ্দিন আহমেদ, এসবি কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান ও সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক নিহত হন।[১৮০] কেবলমাত্র তার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[১৮১]

শেখ মুজিবের শরীরে মোট ১৮টি বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, একটি বুলেটে তার ডান হাতের তর্জনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৮২] শেখ মুজিব ও তার পরিবারের মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করতে সেনা সদর থেকে ঢাকা সেনানিবাসের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি গিয়ে আবিষ্কার করেন নির্দিষ্ট কফিনে শেখ মুজিবের মরদেহ মনে করে তার ভাই শেখ নাসেরের মরদেহ রাখা হয়েছে। দায়িত্বরত সুবেদার এর ব্যাখ্যা দেন যে, দুই ভাই দেখতে অনেকটা একরকম হওয়ায় ও রাতের অন্ধকারের কারণে মরদেহ অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল।[১৮৩][১৮৪] পরের দিন ১৬ আগস্ট শেখ মুজিবের মরদেহ জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সামরিক তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়।[১৮৫] অন্যান্যদেরকে ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।[১৮৩]

প্রতিক্রিয়া ও বিচার

মূল নিবন্ধ: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ বাংলাদেশে অভ্যুত্থান

সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সামরিক কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবের প্রাক্তন সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতির পদে স্থলাভিষিক্ত হন।[১৮৬]

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খন্দকার মোশতাক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (দায়মুক্তির অধ্যাদেশ) জারি করেন[১৮৭] এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তানপন্থী[১৮৮] প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে তার বৈধতা দেয়া হয়, যা ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে জাতীয় সংসদে রহিত করা হয়। সংবাদমাধ্যমে এ হত্যাকাণ্ডের ইন্ধনদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-কে দায়ী করা হয়।[১৮৯] লরেন্স লিফশুলজ বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বুস্টারের সূত্রে সিআইএ-কে সামরিক অভ্যুত্থান ও গণহত্যার জন্য দোষারোপ করেন।[১৯০] মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বহু বছরের জন্য চলমান রাজনৈতিক সংঘাতের সূচনা ঘটে। সেনা অভ্যুত্থানের নেতারা অল্পদিনের মধ্যে উচ্ছেদ হয়ে যান এবং অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে দেশে চলমান অচলাবস্থা তৈরি হয় ও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তৃতীয় সেনা অভ্যুত্থানের ফলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আসীন হয়।[১৯১] তিনি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সমর্থন করে মুজিব হত্যার বিচার স্থগিত করে দেন এবং মুজিবপন্থী সেনাসদস্যদের গ্রেফতার করেন।[১৭৮] সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ১৪ জন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন।[১৪][১৯২] ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় মুজিব হত্যাকাণ্ডের মামলা দায়ের করেন[১৯৩] এবং ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিচারক কাজী গোলাম রসুল শেখ মুজিব হত্যার বিচারের এজলাস গঠন করেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে রায়ের বিরুদ্ধে কৃত আপিলে হাইকোর্টের দুইটি বেঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রায় দেয়। ফলে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মামলাটি তৃতীয় বেঞ্চে পাঠানো হয় এবং সেখানে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকে।[টীকা ১৫] ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ৫ জন আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[টীকা ১৬][১৯৪] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল অন্যতম আসামি আব্দুল মাজেদকে ভারত থেকে বাংলাদেশে এনে গ্রেফতার করা হয় এবং ১২ই এপ্রিল তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।[১৯৫][১৯৬]

ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার

আরও দেখুন: শেখ-ওয়াজেদ পরিবার

মুজিব ও তার স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দাদা আব্দুল হামিদের আদেশে শেখ মুজিবের বাবা ১৪ বছর বয়সী শেখ মুজিবকে তার ৩ বছর বয়সের সদ্য পিতৃ-মাতৃহীন চাচাতো বোন বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিয়ে দেন।[টীকা ১৭][১৯৭] বেগম ফজিলাতুন্নেছার বাবা শেখ জহিরুল হক ছিলেন মুজিবুর রহমানের চাচা। বিয়ের ৯ বছর পর ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব ২২ বছর বয়সে ও ফজিলাতুন্নেসা ১২ বছর বয়সে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন।[১৯৮] এই দম্পতির ঘরে দুই কন্যা এবং তিন পুত্রের জন্ম হয়–শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা এবং শেখ রাসেল।[১৮]

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা অক্টোবর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ পরিবারকে এই বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রাখে।[১৯৯] শেখ কামাল ও জামাল পাহারারত সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন। শেখ কামাল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের একজন সমন্বয়ক ছিলেন এবং স্বাধীনতা

যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধকালীন কমিশন লাভ করেন।[২০০] তিনি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর এডিসি ছিলেন।[২০০] তাকে শেখ মুজিবের শাসনামলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[২০১] শেখ জামাল যুক্তরাজ্যের রয়েল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে যোগ দেন।[২০২][২০৩][২০৪][২০৫]

শেখ হাসিনা

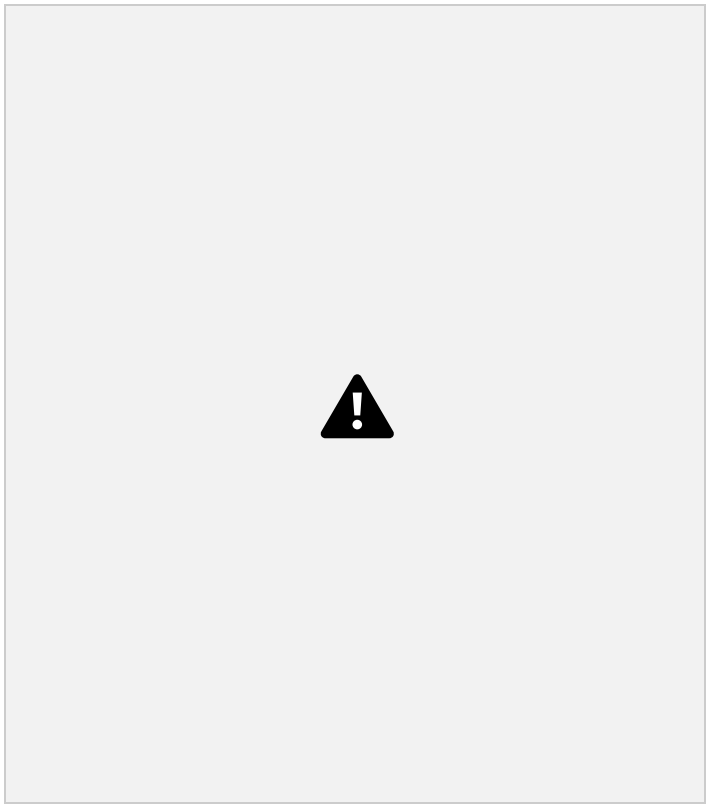

শেখ রেহানা

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবিত দুই সন্তান

শেখ মুজিবের প্রায় পুরো পরিবারই ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট রাতে সেনা অভিযানে নিহত হন। কেবলমাত্র দুই কন্যা–শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঐসময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানের কারণে বেঁচে যান। শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ মেয়াদে এবং ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[২০৬] তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবেও তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।[২০৭]

শেখ রেহানার কন্যা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেবার পার্টির রাজনীতিবিদ টিউলিপ সিদ্দিক[২০৮] ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সের সদস্য (গ্রেটার লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন আসন থেকে নির্বাচিত)।[২০৯] শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত শ্রমিকনেতা ও তার মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন।[২১০][২১১] ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুজিব বাহিনীর প্রধান নেতা ছিলেন ও ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন (উভয়েই ১৫ আগস্ট নিহত হন)।[২১১][২১২] বর্তমানে শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ[২১০] এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ হেলাল উদ্দীন ও শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল বাংলাদেশের সাংসদ।[২১৩] শেখ ফজলে নূর তাপস,[২১২] মজিবুর রহমান চৌধুরী, নূর-ই-আলম চৌধুরী, আন্দালিব রহমান, শেখ তন্ময়, সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ, শেখ ফজলে শামস পরশ,[২১২] এবং শেখ ফজলে ফাহিম–বাংলাদেশের প্রথমসারির রাজনীতিবিদ ও সম্পর্কে তার নাতি হন।[২১৩]

রচিত গ্রন্থাবলি

শেখ মুজিব দুই খণ্ডে তার আত্মজীবনী লিখেছিলেন, যেখানে তিনি স্বীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত জীবনেরও বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি তার চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও লিখে রেখেছিলেন। এইসব রচনা তার মৃত্যুর পর তদ্বীয় তনয়া শেখ হাসিনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।[২১৪][২১৫] তার রচিত বইগুলোর রচনাশৈলীতে সাহিত্যের গুণগতমান খুঁজে পাওয়ায় তাকে লেখক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।[২১৬]

নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশনী	বিষয়বস্তু	তথ্যসূত্র
অসমাপ্ত আত্মজীবনী	জুন ২০১২	দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড	শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজের জীবনী লিখেছেন। এই গ্রন্থটি ইংরেজিসহ আরও কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়।	[২১৭][২১৮]
কারাগারের রোজনামচা	মার্চ ২০১৭	বাংলা একাডেমি	গ্রন্থটি ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানের কারাভোগের দিনলিপি। গ্রন্থটির নামকরণ করেন তার কনিষ্ঠা কন্যা শেখ রেহানা।	[২১৯][২২০]
আমার দেখা নয়াচীন	ফেব্রুয়ারি ২০২০	বাংলা একাডেমি	১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে গণচীনের পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে শেখ মুজিবের চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত।	[৪৮][২২১][২২২]
আমার কিছু কথা	২০২০	ইতিহাস প্রকাশন		[২২৩]

রাজনৈতিক মতাদর্শ

মূল নিবন্ধ: মুজিববাদ

ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে মুজিবের রাজনৈতিক দর্শন। এই সময় থেকেই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মুসলিম লীগে তিনি ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন উপদলে, যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিলেন।[১৩৯] তবে মুসলিম লীগের প্রতি দলীয় আনুগত্যের তুলনায় সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তার ব্যক্তিগত আনুগত্য প্রবল ছিল।[১৩৯] আবদুল গাফফার চৌধুরীর মতে, শেখ মুজিব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্য হিসেবে পরিচিত হলেও তার রাজনৈতিক চরিত্র গড়ে উঠেছিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আবুল হাশিম, সুভাষ বসু ও মাওলানা ভাসানীর রাজনীতির প্রভাব বলয়ে থেকে।[২২৪] তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন; আবার তিনি যুক্তবঙ্গ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগেও সামিল হন।[টীকা ১৮][১৩৯] অনেক ঐতিহাসিক শেখ মুজিবের তৎকালীন জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমান জাতীয়তাবাদ হিসেবে বর্ণনা করেন। তার নিজের ভাষ্য অনুযায়ী তারা, অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজ লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও আসাম নিয়ে ভারতের বাইরে পৃথক রাষ্ট্রের ধারণার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বাস্তবতায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালি মুসলমানের ভবিষ্যৎ গড়তে বাধ্য হন।[১৩৯][২২৫]

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই (পেছনে) ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (বামে) সাথে শেখ মুজিব

পাকিস্তান সৃষ্টির পর শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে ঘিরে আবর্তিত হয়।[২২৫] মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে আরো অনেকের সাথে শেখ মুজিব এই দল থেকে সরে দাঁড়ান। ২৪ বছরের পাকিস্তান আমলের অর্ধেকটা সময় কারাগারে এবং দু-এক বছর ছাড়া পুরোটা সময় জুড়ে বিরোধীদলে অবস্থান করেই তিনি কাটিয়ে দেন।[২৯] একক পাকিস্তান ধারণার ভঙ্গুরতার বিষয়টি তার লেখা ডায়েরি ও অসংখ্য বক্তৃতায় উঠে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা "পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র করছেন" এমন অভিযোগ তুলে তাকে প্রায়ই পাকিস্তানের দুশমন, ভারতের দালাল ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[২৯][২২৫]

রাজনৈতিক গুরু সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতোই শেখ মুজিব ছিলেন পশ্চিমা ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক।[১৩৯] পাকিস্তান আমলের পুরোটা সময় জুড়ে তজ্জন্যে আন্দোলন সংগ্রাম করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ক্ষমতা গ্রহণ করে

প্রথমদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।[২২৬] পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ক্রমাগত সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে দুইবার গণচীন ও একবার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে জনগণের জীবনমান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাদের প্রদর্শিত সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি শেখ মুজিবের আগ্রহ বাড়তে থাকে।[২২৬] তিনি আওয়ামী লীগকে ব্রিটিশ লেবার পার্টির মতো সামাজিক গণতন্ত্রী দল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইতেন। তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের একটি মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেন।[২৯] তবে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের দমন-নিপীড়ন ও বাকশাল গঠন করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন; সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য জেল-জুলুম সহ্য করে শেষে নিজেই তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ায় অনেকে একে আদর্শচ্যুতি হিসেবে অভিহিত করেন।[১৫১]

মুসলিম লীগের মাধ্যমে রাজনীতির হাতেখড়ি হলেও শেখ মুজিব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পরবর্তী জীবনে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাজনীতি করেন।[টীকা ১৯][২২৯] তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন। তার দল আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার সকল ধর্মের বাঙালির সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই দল ও পরবর্তীকালে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।[১৩৯] ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামি অনুশাসনের পথে অগ্রসর হন।[১৪৭] জনসাধারণের সামনে উপস্থিতি এবং ভাষণের সময় শেখ মুজিব ইসলামিক সম্ভাষণ ও শ্লোগান ব্যবহার বাড়িয়ে দেন এবং ইসলামিক আদর্শের কথা উল্লেখ করতে থাকেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে মুজিব তার স্বভাবসুলভ "জয় বাংলা" অভিবাদনের বদলে ধার্মিক মুসলিমদের পছন্দনীয় "খোদা হাফেজ" বলতেন।[১৪৭] শেখ মুজিবুর রহমান মনে করতেন, মানুষ ভুল থেকেই শেখে। তার মতাদর্শ নিজের ভুল স্বীকার ও সংশোধনের পক্ষে ছিল।[টীকা ২০][২২৮]

মূল্যায়ন

উপাধি

- ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত সম্মেলনে লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন।[৯০]
- আ. স. ম. আবদুর রব ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করেন।[২২৯] পরবর্তীকালে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী তাকে সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের "জাতির পিতা" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[২৩০]
- ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলা'র পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে পরিচালিত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।[৩]
- ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে কূটনীতিকেরা তাকে 'বিশ্ব বন্ধু' (ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আখ্যা দেয়।[২৩১]

প্রাপ্তি ও পুরস্কার

বিশ্ব শান্তি পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও ক্যুরি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশীয় শান্তি ও নিরাপত্তা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।[২৩২][২৩৩] এটি বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক পদক।[২৩৩][২৩৪]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক পত্রিকা শেখ মুজিবুর রহমানকে "রাজনীতির কবি" বলে আখ্যায়িত করে লিখে, "তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন, সমাবেশে এবং আবেগময় বাগ্মিতায় তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাঁদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। তিনি রাজনীতির কবি।"[২৩৫] কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বকে হিমালয় পর্বতমালার সাথে তুলনা করে বলেন:

> "আমি হিমালয় দেখিনি তবে আমি মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।"[২৩৬][২৩৭]

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে ফিরে আসার পর ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তবে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠন করলে এ ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটে। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন বাতিল করে দেয়। পরে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আবারও রাষ্ট্রীয়ভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আসলে আবারও ১৫ই আগস্টকে শোক দিবস ঘোষণা করা হয়।[২৩৮] বাংলাদেশি প্রতিটি ধাতব মুদ্রা ও টাকায় শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি রয়েছে এবং বাংলাদেশের বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান তার নামে নামকরণ করা হয়েছে।[২৩৯]

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।[২৪০] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় "মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে অবদানের স্বীকৃতি" হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান করে।[২৪১][২৪২][২৪৩]

২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।[২৪৪] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থার (ইউনেস্কো) নির্বাহী পরিষদের ২১০তম অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দ্বিবার্ষিক "ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্য ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি" (সৃজনশীল অর্থনীতি খাতে ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে ইউনেস্কোর ৪১তম সাধারণ অধিবেশনকাল থেকে পুরস্কারটি প্রদান করা হবে।[২৪৫]

শেখ মুজিবুর রহমান এখনও আওয়ামী লীগের আদর্শগত প্রতীক হয়ে আছেন এবং দলটি মুজিবের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ধারণ করে চলেছে। আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদগণ শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি সম্মান জানিয়ে "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু" বলে ভাষণ ও বাণী সমাপ্ত করেন। শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক প্রচারণায় যে কোট পরতেন, সেটিকে মুজিব কোট নামে ডাকা হয় এবং আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলের রাজনীতিবিদগণ আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিব কোট পরিধান করে থাকেন।[২৪৬] তিনি বাংলাদেশ, ভারত ও বিশ্বের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং গোষ্ঠীগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বাঙালিদের আন্দোলনকে স্বাধীনতার পথে ধাবিত করার জন্য তিনি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত।[১৯২]

সমালোচনা

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের একরোখা কার্যকলাপকে দায়ী করা হয়।[৫২] আবার, পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের দলীয় মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সাথে অন্তর্বিরোধে লিপ্ত হন তিনি, যা শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে অমোচনীয় বিভেদ তৈরি করে। অনেক সহকর্মী তার বিরুদ্ধে নিজের প্রাধান্যপ্রীতির অভিযোগ তোলেন।[২৪৭] এদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ তার সমালোচনা করে লেখেন–

> "সত্যই মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই দুর্বলতা ছিল যে তিনি যেটাকে পার্টি-প্রীতি মনে করিতেন সেটা ছিল আসলে তাঁর ইগইজম আত্মপ্রীতি। আত্মপ্রীতিটা এমনি 'আত্মভোলা' বিভ্রান্তিকর মনোভাব যে ভাল ভাল মানুষও এর মোহে পড়িয়া নিজের পার্টির, এমনকি নিজেরও অনিষ্ট করিয়া বসেন।"[২৪৭]

এছাড়াও কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতরের সংঘাত এবং বৈষম্যগুলোকে শেখ মুজিব ও তার দল অতিরঞ্জিত করেছিল এবং স্বাধীনতা বাংলাদেশকে শিল্প ও মানবসম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন করে।[২৪৮] সৌদি

আরব, সুদান, ওমান ও চীন প্রভৃতি দেশের সরকার শেখ মুজিবের সমালোচনা করে এবং মুজিবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকে।[১৫৭][১৪৮]

বাংলাদেশের নেতা হিসেবে শাসনকালে, মুসলিম ধর্মীয় নেতারা মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কারণে তার সমালোচনা করেন। ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে ব্যাপক সহযোগিতা গ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের সাথে একাত্মতার কারণে অনেকে মুজিবের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। সমালোচকদের অনেকে আশঙ্কা করেন, বাংলাদেশ ভারতের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে একটি স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।[১৫১] তবে শেখ মুজিবের শাসন দক্ষতার জন্যই তা বাস্তবায়িত হয়নি।[১৪৯] মুজিবের একদলীয় শাসন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দমন জনগণের একটি বড় অংশের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে দীর্ঘসময়ের জন্য কক্ষচ্যুত করে।[১৫১] স্বাধীনতা ও শেখ মুজিবের শাসনের এক বছর পর, টাইম সাময়িকী লিখে:

> "মোটের উপর, বাংলাদেশের শুভ প্রথম জন্মদিন পালন করার তেমন কোন কারণ নেই। যদিও এটি একসময় হেনরি কিসিঞ্জারের কথিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' না হয়, তবে এটি মুজিবের স্বপ্ন দেখা সোনার বাংলাও হয়ে যায়নি। এতে মুজিবের ভুল কতটুকু সেটিই এখন একটি বিতর্কের বিষয়। এটা সত্য যে, বাংলাদেশের এই বিস্তর সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে তিনি খুব অল্পই সময় পেয়েছেন। তবুও, কিছু সমালোচক দাবি করেন যে, তিনি যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করেছেন, (যেমন তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে-কোন আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে সাড়া দিয়েছেন) যখন কি-না গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা রাষ্ট্রের প্রতি তার আরও মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। যদি, আশানুরূপভাবে, তিনি মার্চের নির্বাচনে জয়ী হন, তবে তিনি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন যে, তিনি কি শুধুই বাংলাদেশের জনক না-কি পাশাপাশি এর ত্রাণকর্তাও।"[১৫০]

যুক্তরাষ্ট্রের টাইম সাময়িকী ২৫শে আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর দশ দিন পর "১৫ই আগস্ট ১৯৭৫: মুজিব, স্থপতির মৃত্যু" শিরোনামে লিখে:

> "তার প্রশংসনীয় উদ্যোগ: স্বাধীনতার পরের তিন বছরে ৬ হাজারেরও বেশি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। সহিংসতা সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হলে মুজিব রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। চরম-বাম ও চরম-ডানপন্থী সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়, পত্রিকাগুলোকে নিয়ে আসা হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। এ উদ্যোগগুলো বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে গৃহীত হলেও অনেকেই সমালোচনামুখর হয়ে উঠেন। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে মুজিব তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন—"ভুলে যেওনা আমি মাত্র তিন বছর সময় পেয়েছি। এই সময়ের মধ্যে তোমরা কোনো দৈব পরিবর্তন আশা করতে পারো না।" যদিও শেষ সময়ে তিনি নিজেই হতাশ ও বিরক্ত হয়ে কোন দৈব পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। সন্দেহাতীতভাবেই মুজিবের উদ্দেশ্য ছিলো তার দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়ন ঘটানো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুজিব একটা সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, যে সোনার বাংলার উপমা তিনি পেয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে, ভালোবেসে মুজিব সেই 'সোনার বাংলা'র স্বপ্নকে তার দেশের জাতীয় সংগীত নির্বাচন করেছিলেন।"[১৫১]

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রন্টলাইন সাময়িকীর একটি প্রবন্ধে লেখক ডেভিড লুডেন তাকে একজন "ফরগটেন হিরো" বা বিস্মৃত বীর বলে উল্লেখ করেন।[১৫২]

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে মুজিবের মৃত্যুর পরবর্তী সরকারগুলোর মুজিব বিরোধিতা ও মুজিবের স্মৃতিচারণ সীমিতকরণের কারণে তার সম্পর্কে জনমনে নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর শেখ মুজিবুরের ভাবমূর্তি আবার ফিরে আসে। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে ডিজিটাল আইন-২০১৬ মোতাবেক যে-কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদালত কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত মীমাংসিত কোনো বিষয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা বা প্রোপাগান্ডা চালালে বা অবমাননা করলে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেয়া হবে।[২৫৩][২৫৪]

জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে

মূল নিবন্ধসমূহ: জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের তালিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অসংখ্য ফিকশন ও নন-ফিকশন বই, পুস্তিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার কন্যা শেখ হাসিনা রচনা করেছেন শেখ মুজিব আমার পিতা। তাকে ঘিরে স্মৃতিচারণামূলক বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–এ বি এম মূসার বই মুজিব ভাই,[২৫৫] বেবী মওদুদ রচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার।[২৫৬] মুজিবহত্যা নিয়ে গবেষণামূলক বইয়ের মধ্যে রয়েছে–মিজানুর রহমান খানের মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড,[২৫৭][২৫৮] এম আর আখতার মুকুল রচিত মুজিবের রক্ত লাল[২৫৯] প্রভৃতি। শেখ মুজিবের শাসনামলের বিবরণ উঠে এসেছে এমন বইয়ের মধ্যে রয়েছে–মওদুদ আহমেদ রচিত বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল,[২৬০] অ্যান্থনি মাসকারেনহাস কর্তৃক রচিত বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ,[২৬১] হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস দেয়াল,[২৬২][২৬৩] নিয়ামত ইমাম রচিত উপন্যাস দ্য ব্ল্যাক কোট[২৬৪] প্রভৃতি।

শেখ মুজিবকে নিয়ে অনেক গানও রচিত হয়েছে। এর মধ্যে বিখ্যাত দুটি গান হল–১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতীয় গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত "শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ"[২৬৫][২৬৬] এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে হাসান মতিউর রহমান কর্তৃক রচিত "যদি রাত পোহালে শোনা যেত, বঙ্গবন্ধু মরে নাই"।[২৬৭] গান দুটিতে সুরারোপ করেন যথাক্রমে অংশুমান রায়[২৬৮] ও মলয় কুমার গাঙ্গুলী।[২৬৭] কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বিপন্ন ও বন্দি শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষায় বিচলিত চিত্তে ও প্রবল আবেগের বশবর্তী হয়ে রচনা করেন–

> "যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
> গৌরী মেঘনা বহমান
> ততকাল রবে কীর্তি তোমার
> শেখ মুজিবুর রহমান।"[২৬৮]

২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনস্থিত শেখ মুজিব রিসার্চ সেন্টারের অর্থায়নে লেখক ও সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী তার লিখিত রাজনৈতিক উপন্যাস "পলাশী থেকে ধানমন্ডি" অবলম্বনে একই নামে একটি টেলিভিশন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এতে শেখ মুজিব চরিত্রে অভিনয় করেন পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়।[২৬৯] ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রতের পরিচালনায় "যুদ্ধশিশু" নামক একটি ভারতীয় বাংলা-হিন্দি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। চলচ্চিত্রে প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রে অভিনয় করেন।[২৭০][২৭১] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে "আগস্ট ১৯৭৫" নামে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড পরবর্তী ঘটনা নিয়ে একটি বাংলাদেশি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও করোনা মহামারিজনিত জটিলতার কারণে সেটি পিছিয়ে যায়।[২৭২][২৭৩] এছাড়া ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক "বঙ্গবন্ধু"[২৭৪] নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণাধীন রয়েছে।[২৭৫] চলচ্চিত্রটি বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হবে।[২৭৬][২৭৭] তাছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ অবলম্বনে "চিরঞ্জীব মুজিব" নামক একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণাধীন রয়েছে।[২৭৮][২৭৯] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের অর্থায়নে শেখ হাসিনা লিখিত "মুজিব আমার পিতা" গ্রন্থ অবলম্বনে একই নামে একটি অ্যানিমেটেড কার্টুন চলচ্চিত্রও নির্মাণাধীন রয়েছে।[২৮০]

শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ

মূল নিবন্ধ: শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণের তালিকা

ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্কয়ার ভাস্কর্য

বাংলাদেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে; যার প্রায় সবই শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা। এছাড়া বাংলাদেশের বাইরেও বহু স্থাপনা ও সড়কের নাম শেখ মুজিবুর রহমানের নামে করা হয়েছে। মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম উৎক্ষেপিত কৃত্রিম উপগ্রহ "বঙ্গবন্ধু-১" এর নামকরণ শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে রাখা হয়েছে।[২৮১] বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু যমুনা বহুমুখী সেতুর নাম পরিবর্তন করে "বঙ্গবন্ধু সেতু" করা হয়।[২৮২] এছাড়াও ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে গুলিস্তানে অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় স্টেডিয়াম "ঢাকা স্টেডিয়ামের" নাম পরিবর্তন করে "বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম" রাখা হয়।[২৮৩] ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার শেরে বাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে অবস্থিত চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে "বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র" নামে পুনর্বহাল করা হয়।[টীকা ২১][২৮৪][২৮৫] ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে "ভাসানী নভোথিয়েটারের" নাম পরিবর্তন করে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার" রাখা হয়।[২৮৬]

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার "ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ" (আইপিজিএমআর)-কে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" নাম রাখা হয়।[২৮৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই "জিন্নাহ সড়কের" নাম পরিবর্তন করে "শেখ মুজিব সড়ক" নামে চট্টগ্রাম শহরের বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদের প্রধান সড়কের নামকরণ করা হয়।[২৮৮] এছাড়াও ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির একটি সড়কের নাম "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মার্গ" রাখা হয়। কনট প্লেসের নিকটবর্তী স্থানটি ইতোপূর্বে "পার্ক স্ট্রিট" নামে পরিচিত ছিল।[২৮৯]

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন "বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ" নামে একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে।[২৯০] মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগকে (বিপিএল) "বঙ্গবন্ধু বিপিএল" নামে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।[২৯১] এছাড়াও মুজিব বর্ষ উপলক্ষে শেখ মুজিবের নামে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের বাংলাদেশ গেমসের ৯ম আসরের নামকরণ "বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস" করা হয়।[২৯২] তবে করোনাভাইরাস মহামারির কারণে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন গেমস স্থগিত ঘোষণা করে।[২৯৩]

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন[২৯৪] উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) মুজিব ১০০ টি২০ কাপ বাংলাদেশ ২০২০ নামে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে এশিয়া একাদশ বনাম বিশ্ব একাদশের মধ্যকার দুইটি টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক (টি২০আই) খেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।[২৯৫][২৯৬] তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) স্বীকৃত ঐ খেলাগুলোকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক খেলার মর্যাদা দিলেও,[২৯৭] বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারির কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়।[২৯৮]

মুজিব বর্ষ

মূল নিবন্ধ: মুজিব বর্ষ

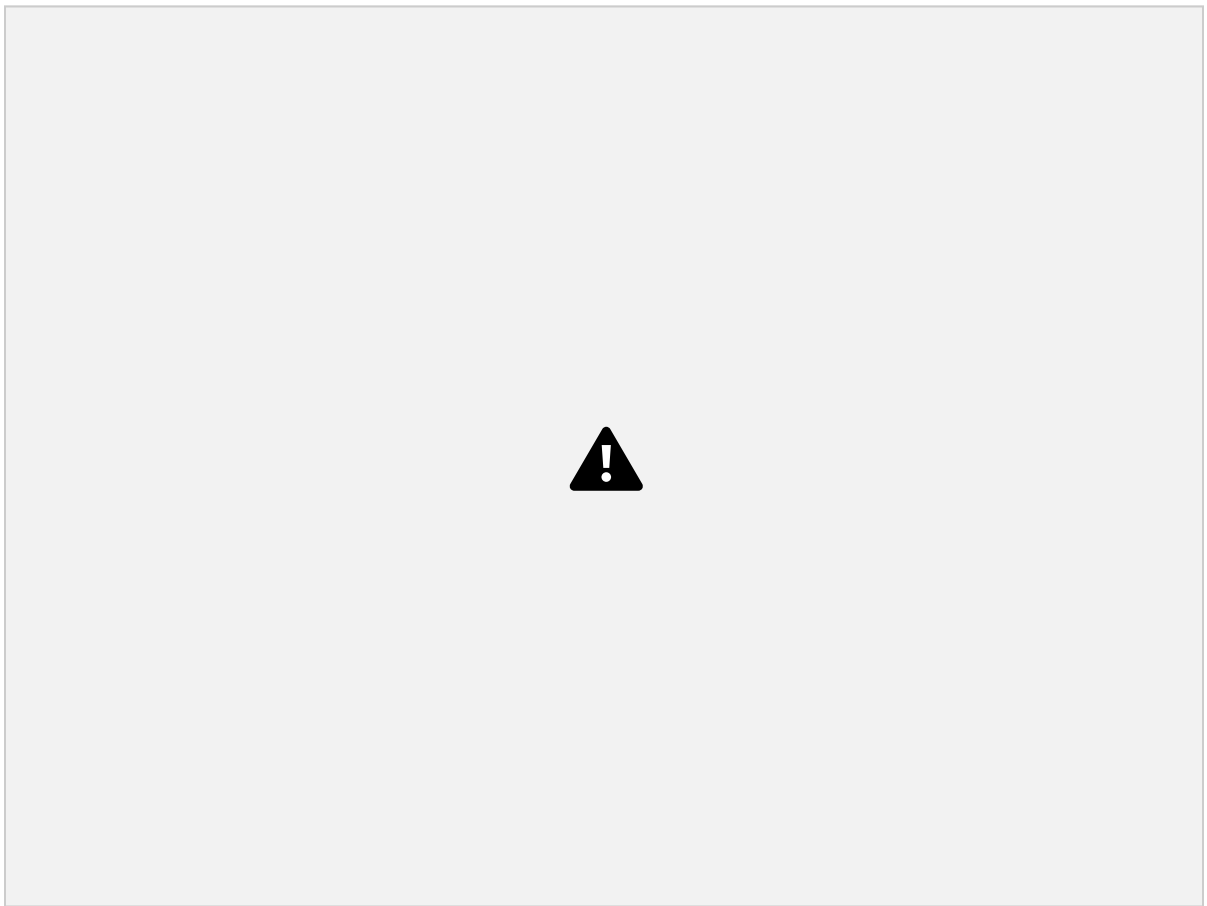

মুজিব বর্ষের লোগো

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের সামসময়িক প্রধানমন্ত্রী ও শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বৈঠকে ২০২০-২১ খ্রিষ্টাব্দকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেন।[২৯৯][৩০০] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এ বর্ষ উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।[৩০১][৩০২] কিন্তু করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে অধিকাংশ কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদিত না হওয়ায় মুজিব বর্ষের সময়সীমা ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়।[৩০৩] ইউনেস্কোর ১৯৫টি সদস্য দেশে এই মুজিব বর্ষ পালন করা হয়।[৩০৪][৩০৫]

চিত্রশালা

-

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরমানিটোলায় বক্তৃতারত শেখ মুজিব

-

  ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে টুঙ্গিপাড়ার পৈতৃক ভিটায় শেখ মুজিব

-

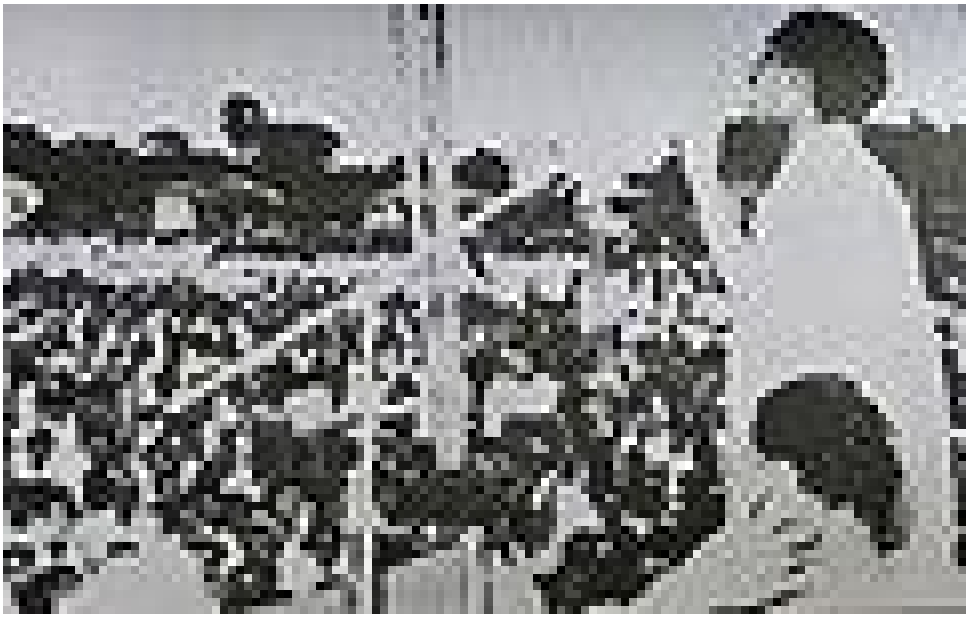

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে গণসংযোগে শেখ মুজিব

-

যুক্তফ্রন্টের এক সভায় শেখ মুজিব (বাম থেকে দ্বিতীয়)

-

  হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে শেখ মুজিব

-

জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে আলোচনারত শেখ মুজিব

-

টাওয়ার হ্যামলেট্স, লন্ডনে শেখ মুজিবের আবক্ষ ভাস্কর্য

-

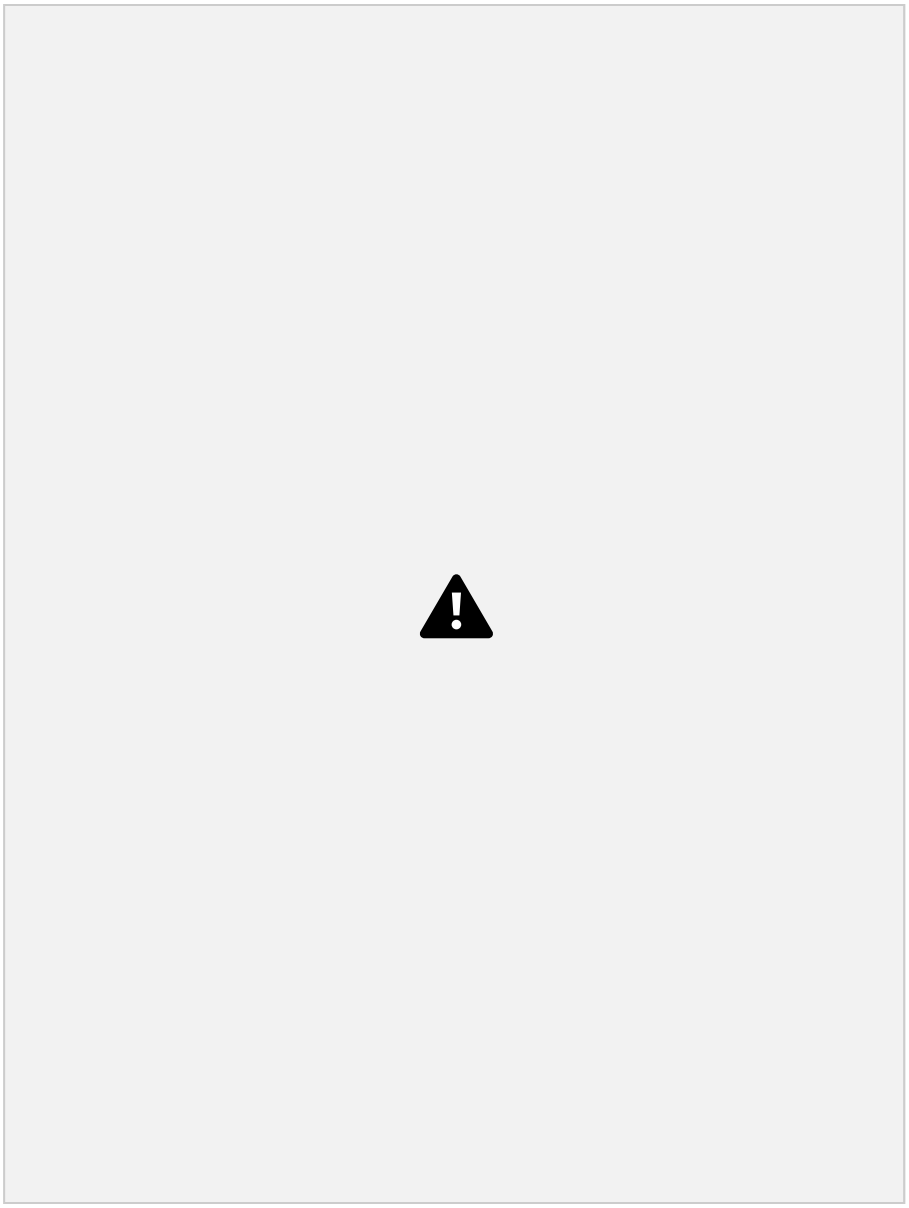

লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে শেখ মুজিবের ভাস্কর্য

-

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

আরও দেখুন

- বাংলাদেশের ইতিহাস
- মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি
- শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা
- শেখ মুজিবুর রহমানের তৃতীয় মন্ত্রিসভা
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

পাদটীকা

1. ↑ শেখ মুজিবুর রহমান তার "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বইতে লিখেছেন–"আমরা আশা করেছিলাম আমাদের কাছাড় জেলা ও সিলেট জেলা পাকিস্তানের ভাগে না দিয়ে পারবে না। আমার বেশি দুঃখ হয়েছিল করিমগঞ্জ নিয়ে, কারণ করিমগঞ্জে আমি কাজ করেছিলাম গণভোটের সময়, নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করেন জনগণকে খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা পূর্ববাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল, সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম।"

2. ↑ পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশে খাদ্যাভাব মোকাবেলায় কর্ডন প্রথা চালু করে। এর ফলে এক জেলার খাদ্যশস্য অন্য জেলায় নেয়া যেত না। এই প্রথার ফলে ধান-কাটা শ্রমিকেরা অন্য জেলায় গিয়ে ধান কেটে নিজ জেলায় আনতে পারত না।
3. ↑ আসামিরা সকলেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তারা হলেন–শেখ মুজিবুর রহমান, আহমেদ ফজলুর রহমান, সিএসপি, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সাবেক এলএস সুলতানউদ্দীন আহমদ, এলএসসিডিআই নূর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজ উল্লাহ, কর্পোরাল আবদুস সামাদ, সাবেক হাবিল দলিল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুস, সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক, বিভূতি ভূষণ চৌধুরী (ওরফে মানিক চৌধুরী), বিধান কৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, সাবেক কেরানি মুজিবুর রহমান, সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. আব্দুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এ. বি. খুরশীদ, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান, সিএসপি, একেএম শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট শামসুল হক, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আব্দুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন এ. শওকত আলী, ক্যাপ্টেন খোন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এ. এন. এম নূরুজ্জামান, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী, লে. এম রহমান, সাবেক সুবেদার তাজুল ইসলাম, আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দীন এবং ল্যা. আবদুর রউফ।
4. ↑ গ্রেফতার সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয় যে,

“ গত মাসে (অর্থাৎ ডিসেম্বর, ১৯৬৭) পূর্ব পাকিস্তানে উদঘাটিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ” থাকার অভিযোগে এঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

5. ↑ শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন:

“একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে ‘বাংলা’ শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। ‘বাংলা’ শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে ‘পূর্ব পাকিস্তানের’ বদলে ‘বাংলাদেশ’ ডাকা হবে।”

6. ↑ শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ৩৫ দফা হলো:
    1. সরকারি সংস্থাসমূহ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবে।
    2. সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকবে।
    3. (ক) ডেপুটি কমিশনারগণ এবং মহকুমা অফিসারগণ তাদের দপ্তর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করবেন। (খ) পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন। (গ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।
    4. বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবেন। পণ্য আনা-নেওয়া, শুল্ক আদায় চালু থাকবে। তবে কোনো সমরাস্ত্র আনা-নেওয়া যাবে না।
    5. আমদানিকৃত মাল দ্রুত খালাস করতে হবে এবং শুল্ক বিভাগ কাজ করে যাবে। এজন্য ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকে হিসাব খুলতে হবে। হিসাব আওয়ামী লীগের নির্দেশনায় পরিচালনা করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো কর দেওয়া যাবে না।
    6. রেলওয়ে চলাচল করবে। আমদানিকৃত খাদ্যশস্য আনা-নেওয়া অগ্রাধিকার পাবে। কোনো সমরাস্ত্র আনা-নেওয়ায় রেলওয়ে সাহায্য করবে না। রেলওয়ে চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় দপ্তর শুধু খোলা থাকবে।
    7. সারা দেশে ইপিআরটিসির সড়ক পরিবহন চালু থাকবে।

8. অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য ইপিএসসি অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও আইডব্লিউটিএ-র কিছু সংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। রণসম্ভার আনা-নেওয়ার কাজে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।
9. শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানি-অর্ডার প্রেরণ করা যাবে। বিদেশের সাথে কেবল চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম আদান-প্রদান চলবে। ডাক সঞ্চয় ও বিমা কোম্পানি কার্যরত থাকবে।
10. কেবল বাংলাদেশের মধ্যে আন্তঃজেলা টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে।
11. বেতার, টেলিফোন ও সংবাদপত্রগুলো কাজ চালিয়ে যাবেন এবং আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করবেন। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা না করে, তবে এর কর্মীরা কাজ করবেন না।
12. জেলা হাসপাতাল, টিবি হাসপাতাল, কলেরা ইন্সটিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সার্ভিসগুলো কাজ করে যাবে। সারাদেশে ওষুধ সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।
13. বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইপিওয়াপদার ব্যক্তিরা কাজ করে যাবেন।
14. গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।
15. ইটভাটা ও অন্যান্য কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।
16. আমদানি, বণ্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্য চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে।
17. ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয়, চলাচল ও বণ্টন অব্যাহত থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলোকে কৃষিঋণ দেওয়া অব্যাহত থাকব। কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলো ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া বলবৎ থাকবে।
18. বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়নকাজ ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে।
19. সকল সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন প্রকল্প, বিদেশি অর্থায়নে রাস্তা ও সেতুনির্মাণ চালু থাকবে।
20. ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজ, সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ অব্যাহত থাকবে।
21. ইপিআইডিসি, ইপসিক কারখানা ও ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ চালু থাকবে।
22. সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন নির্দিষ্ট সময়ে দিয়ে দিতে হবে।
23. সামরিক বিভাগসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন নির্দিষ্ট তারিখ পরিশোধ করতে হবে।
24. সরকারি কর্মচারীদের বিল তৈরির জন্য এজি(ইপি) ও ট্রেজারির সামান্য সংখ্যক কর্মচারী কাজ করবেন।
25. ব্যাংকিং কার্যক্রম সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম ৪টা পর্যন্ত চলবে। ব্যাংকের সকল কার্যাবলি নিয়মিতভাবে চলবে।
26. স্টেট ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মতো কাজ করবে। বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের নিকট বিদেশে প্রেরণের টাকা গৃহীত হবে।
27. আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও দ্রব্যাদি চলাচলের জন্য আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর খোলা থাকবে।
28. ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশি বিমান পরিবহন অফিস চালু থাকবে।
29. সকল অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা চালু থাকবে।
30. পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, সড়ক বাতি জ্বালানো, সুইপার সেবা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য সেবা চালু থাকবে।
31. ভূমিরাজস্ব, লবণ কর, তামাক কর ও তাঁতিদের সুতায় আবগারি কর আদায় করা যাবে না। অন্যান্য করের অর্থ বাংলাদেশের সরকারের হিসাবে জমা দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।
32. পাকিস্তান কর্পোরেশন ও ডাক জীবন বিমাসহ সকল বিমা কোম্পানি কাজ করবে।
33. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবেই চলবে।
34. সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে।

35. সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

7. ↥ টাইম ম্যাগাজিনের খবরে উল্লেখ করা হয়, "ঢাকায় সেনাবাহিনী ২৪ ঘন্টার কড়া কারফিউ জারি করেছে এবং অমান্যকারীদের তৎক্ষণাৎ গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই, সম্ভবত চট্টগ্রামের কোনো স্টেশন থেকে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। গোপন ওই বেতার কেন্দ্র থেকে মুজিব বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ডাক দেন (টাইমের ভাষায় "sovereign independent Bengali nation") এবং বাংলাদেশের জনগণকে দেশের প্রতিটি জায়গা থেকে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে যদিও প্রত্যক্ষ সামরিক কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত নেই।"
8. ↥ ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, "আমার ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে শেখ মুজিবকে হত্যা করার অনুমতি দাও। আমার জীবনে যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলো শেখ মুজিবকে ফাঁসি কাষ্ঠে না ঝোলানো।"
9. ↥ একটি নতুন দেশ, বাংলাদেশ, জন্ম নিল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর "ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ধর্ষিত বাংলাদেশি অর্থনীতি"র ওপর। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে টাইম সাময়িকীর প্রতিবেদনে বলা হয়:

    গত মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের পর বিশ্বব্যাংকের পর্যবেক্ষক দল দেশের বেশ কয়েকটি শহর "পারমাণবিক বোমা হামলার পরের সকাল"-এর মতো দেখতে বলে মন্তব্য করেন। সে সময় থেকেই ধ্বংসযজ্ঞ বেড়েই চলেছিল। আনুমানিক প্রায় ৬০,০০,০০০টি বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, প্রায় ১৪,০০,০০০ কৃষক পরিবারের নিজের জমিতে চাষবাস করার যন্ত্রপাতি ও পশু নেই। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত, সেতু উধাও এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ অবরুদ্ধ। এক মাস আগে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঠিক পূর্ব-পর্যন্ত এই দেশ ধর্ষিত হয়েছে। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে দেশের প্রায় সব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা তাদের মূলধন পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স তাদের বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ব্যাংক হিসাবে (অ্যাকাউন্ট) ঠিক ১১৭ রুপি (১৬ মার্কিন ডলার) ফেলে গেছে। সেনাবাহিনীও ব্যাংক আর মুদ্রা ধ্বংস করেছে, যার কারণে বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যে মুদ্রার সংকট দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগত গাড়ি রাস্তা থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে কিংবা বন্দর বন্ধ করে দেওয়ার আগেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গাড়ি জব্দ করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

10. ↥ তাকাবি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাতে ক্ষতি কাটিয়ে উঠে কৃষককে প্রদত্ত ঋণ।
11. ↥ বাংলাদেশকে মোট ১৫০টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ভুটান (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, সকাল দশটায়; ভারত স্বীকৃতি দেয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, বেলা এগারোটায়) এবং সর্বশেষ স্বীকৃতি দেয় চীন (৩১ আগস্ট ১৯৭৫)।
12. ↥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা, মুজিবনগর সরকার গঠন, নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধ, বিজয় অর্জন, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনভার গ্রহণ, সংবিধান প্রণয়ন করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিকে প্রথম বিপ্লব বা বাংলাদেশ বিপ্লব আখ্যা দেন শেখ মুজিব সরকার।
13. ↥ টাইম সাময়িকীর ভাষ্যে, নতুন ব্যবস্থার অধীনে সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি, যিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি নিয়োজিত মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। যদিও সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে, তবুও রাষ্ট্রপতি ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ স্থগিত করে দিতেন পারবেন। তাসত্ত্বেও সংসদ "সংবিধানের অবমাননা ও ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত কারণে" কিংবা মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে তিন-চতুর্থাংশের ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারবে। এই সংশোধনী মুজিবকে একক "জাতীয় দল" [বাকশাল] গঠনের ক্ষমতা দেয়, এবং এভাবে সকল রাজনৈতিক বিরোধীদলকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।
14. ↥ ১৫ আগস্ট রাতে ধানমন্ডি ৩২-সহ আশেপাশের তিনটি বাড়িতে মোট ২৬ জনকে হত্যা করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি থেকে মোট নয়জনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

15. ↑ মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকা ১২ জন্য আসামি হলেন–সাবেক মেজর বজলুল হুদা, বরখাস্তকৃত লে. কর্নেল ফারুক রহমান, কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, ল্যান্সার একেএম মহিউদ্দিন, আর্টিলারি লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ, বরখাস্তকৃত লে. কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ, বরখাস্তকৃত মেজর শরিফুল হক ডালিম, অবসরপ্রাপ্ত মেজর নূর চৌধুরী, রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন খান, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল রাশেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ ও অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল আজিজ পাশা।
16. ↑ মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়া পাঁচজন আসামি হলেন–মেজর বজলুল হুদা, লে. কর্নেল ফারুক রহমান, কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, ল্যান্সার একেএম মহিউদ্দিন ও লে. কর্নেল (আর্টিলারি) মহিউদ্দিন আহমেদ।
17. ↑ কারও কারও মতে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তাদের বিয়ে হয়েছিল। ফজিলাতুন্নেসার বাবা ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান, মা মারা যান ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে।
18. ↑ অন্নদাশঙ্কর রায় লেখেন: "শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটি প্রথম কবে আপনার মাথায় এল?' 'শুনবেন?' তিনি (বঙ্গবন্ধু) মুচকি হেসে বললেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সুহরবর্দী (সোহ্‌রাওয়ার্দী) সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালীর এক দেশ।... দিল্লী থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিমলীগ কেউ রাজী নয় তাঁদের প্রস্তাবে।... তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা।... হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলাভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞেস করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে, পাক বাংলা। কেউ বলে, পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না বাংলাদেশ। তারপর আমি শ্লোগান দিই, 'জয়বাংলা'।... 'জয় বাংলা' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জয় বা সাম্প্রদায়িতকার উর্ধ্বে।" [বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন, মাওলা ব্রাদার্স]
19. ↑ ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের এক জনসভায় শেখ মুজিব বলেন:

    "কোনো 'ভুঁড়িওয়ালা' এ দেশে সম্পদ লুটতে পারবে না। গরিব হবে এই রাষ্ট্র ও সম্পদের মালিক, শোষকরা হবে না। এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না। এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি।